ঐ মহাজীবন

শংকর গুহ নিয়োগী স্মরণে

ঐ মহাজীবন

> এই পৃথিবী খুব সুন্দর। আমি পৃথিবীতে এমন এক ব্যবস্থা দেখতে চাই, যেখানে শোষণ থাকবে না।... সুন্দর পৃথিবীকে আমি খুব ভালবাসি। কিন্তু তার চেয়েও আমার কাছে প্রিয় আমার কাজ। ...আমি জানি ওরা আমাকে হত্যা করবে। মরতে তো সবাইকে হবে-ই, আজ অথবা কাল। আমাকে হত্যা করলে আমার কাজ, আমাদের আন্দোলন থেমে থাকবে না।

মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও নিজের কর্তব্য-কর্মে অবিচল এক জন-নেতার এই উক্তি শংকর গুহ নিয়োগী কারখানা মালিকদের ভাড়াটে খুনির গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন ১৯৯১ এর ২৮শে সেপ্টেম্বর। তারপর ছয় বছর কেটে গেল। আজও তাঁর জীবন ও সংগ্রাম জন আন্দোলনের পথে এক সুউচ্চ বাতিঘর। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায় তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন।

মাটির মানুষ

না, মাটির মানুষ বলতে এমন নয় যে সাত চড়ে রা কাড়বে না। আমরা বলতে চাইছি এমন মানুষ যিনি মিশে ছিলেন সেই মাটির সাথে, যাতে তিনি কাজ করেন। আমরা যেসব শ্রমিক নেতাকে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের অধিকাংশই নামে শ্রমিক নেতা হলেও আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা। মধ্যবিত্তদের মত বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন তাঁরা শ্রমিকদের চাঁদার পয়সায়। মধ্যবিত্তসুলভ সমস্ত দোষ ত্রুটি বজায় থাকে তাঁদের মানসিকতায়। এদিক দিয়ে শংকর গুহ নিয়োগী ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

জন্ম তাঁরও অবশ্য জলপাইগুড়ির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। কিন্তু আই.এস.সি. পাশ করার পর সাড়ে সতেরো বছর বয়সে মধ্যবিত্ত জীবনের মোহ ত্যাগ করে তিনি পাড়ি দেন সুদূর ছত্তিশগড়ে। ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ পূর্বের সাতটি জেলা—দুর্গ, রায়পুর, রাজনাদগাঁও, বিলাসপুর, বস্তার, রায়গড় ও সরগুনা—নিয়ে মূলত আদিবাসি অধ্যুষিত বনজ-খনিজ-জল সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল। ৩৩ বছর বয়সে শ্রমিক আন্দোলনের সারা সময়ের কর্মী হওয়ার আগে অবধি সাধারণ শ্রমিকদের মতোই তিনি যুক্ত থেকেছেন উৎপাদনের কাজে - শুরুতে ভিলাই ইস্পাত কারখানার কোক-ওভেন বিভাগে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে, আন্দোলন করার জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর কখনও ঠিকা শ্রমিক হিসাবে পুকুর কাটান-খাল কাটার কাজে, রাস্তা তৈরির কাজে বা খনিতে পাথর ভাঙার কাজে।

শ্রমিক নেতা হওয়ার পরও তাঁর জীবন ধারণের পদ্ধতি এমন ছিল যে সাধারণ শ্রমিকদের থেকে তাঁকে আলাদা করা যেত না। শ্রমিকদের মতোই একটা ভাঙা কুঁড়ে ঘরে তিনি থাকতেন, খেতেন তাঁদেরই মত খাবার, পরতেন তাঁদের মত জামা কাপড়, কথা বলতেন তাঁদেরই ভাষায়। বিয়ে করেছিলেন এক আদিবাসি মহিলা শ্রমিককে, তাঁর দুই মেয়ে এক ছেলেকে অন্য শ্রমিক সন্তানদের থেকে আলাদা করে বোঝা যেত না।

এ কারণে নিয়োগী ছিলেন মেহনতি মানুষের আত্মার আত্মীয়, তাদের 'নিয়োগী ভাইয়া' যাঁর নেতৃত্বে তারা প্রাণ অবধি দিতে পারত।

নতুন পথের দিশারী

১৯৭৭এ নিয়োগী দল্লি রাজহরার ঠিকা-লোহা খনি শ্রমিকদের সংগঠন 'ছত্তিশগড় মাইন্‌স শ্রমিক সংঘ' (CMSS) গড়ে তোলার আগে অবধি ট্রেড ইউনিয়ন বলতে লোকে বুঝত শ্রমিকদের আর্থিক দাবি-দাওয়া আদায়ের সংগঠনকে, যা বেতন, বোনাস, ছুটি ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন ছিল শ্রমিক-জীবনের এক-তৃতীয়াংশ, আট ঘন্টার সংগঠন, যে আটঘন্টা সে কলে-কারখানায় কাটায়।

নিয়োগী মানুষকে খন্ড-বিখন্ড করে দিতে রাজি ছিলেন না। শ্রমিকদের তিনি দেখতেন পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে। যে মানুষ উৎপাদনের কাজ ছাড়া পরিবারে-সমাজে থাকে — খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যা নিয়ে যাকে ভাবতে হয়, যাকে ভাবতে হয় নিজের অবসর বিনোদনের জন্য, সন্তানদের শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য, যাকে সম্পর্ক রাখতে হয় সমাজের অন্য মানুষদের সঙ্গেও। নিয়োগীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা নতুন ধারার ট্রেড ইউনিয়নগুলি আর্থিক দাবি-দাওয়ার জন্য তো লড়তই, পাশাপাশি তাদের কর্মসূচীতে সামিল হত স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি-পরিবেশ-ইতিহাস চেতনা-নারী মুক্তি-সমাজের অন্যান্য শোষিত অংশের মুক্তি।

এটাই বোধ হয় কারণ, যার জন্য সংগঠনগুলির সদস্যরা সংগঠনকে প্রাণ-প্রিয় বলে মনে করতেন, সংগঠনের জন্য আত্মত্যাগে পিছপা হতেন না।

নেশা-মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন তিনি

মদ্য-নিষেধ আন্দোলন নতুন কিছু নয়, কয়েক দশক ধরে গান্ধীবাদীরা মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন, কয়েকটি রাজ্যে তো আইন করে মদ-বিক্রি করা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু মানুষকে কতটা নেশা ছাড়াতে পেরেছে সেসব কর্মসূচী? নিয়োগীর নেতৃত্বে কিন্তু মদ খাওয়া ছেড়েছিলেন প্রায় ১ লাখ মানুষ, যাঁদের অধিকাংশই আদিবাসি, যাঁদের মূল্যবোধে মদ খাওয়া অপরাধ ছিল না, মদ তৈরি করা ও খাওয়া তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। নিয়োগীর পরিকল্পনাধীন মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন সফল হয়েছিল কেননা, নিয়োগী তাকে যুক্ত করেছিলেন শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের সাথে।

১৯৭৭এর ৩রা মার্চ CMSS গঠিত হওয়ার ঠিক তিন মাস পর, ২-৩ জুন শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে ১১জন শ্রমজীবী মানুষকে হত্যা করে শ্রমিক সংগঠনকে, শ্রমিক আন্দোলনকে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল প্রশাসন। শ্রমিকদের অদম্য, লড়াকু মানোভাবের জন্য শেষ অবধি প্রশাসনের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়নি। প্রথম লড়াইএর ফলশ্রুতিতে শ্রমিকদের দৈনিক বেতন দুই-আড়াই টাকা থেকে বেড়ে ষোলো টাকারও বেশি হয়ে যায়। হঠাৎ করে হাতে বেশি কাঁচা পয়সা আসায় শ্রমিকরা মদ খাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেন, মদের ঠিকাদার প্রচুর লাভ করতে থাকে। শহীদের রক্ত মদের ভাঁটির নালায় বওয়াতে নিয়োগী রাজি ছিলেন না।

নিয়োগী শ্রমিকদের বোঝাতে থাকেন, কিভাবে মদের পয়সায় শ্রমিক-বিরোধী শক্তিগুলি লাভবান হয়, কিভাবে নেশা শ্রমিকদের আন্দোলন বিমুখ করে তোলে, মদের নেশা কিভাবে শরীরের-পরিবারের-সমাজের ক্ষতি করে। সময় লেগেছিল বছর তিনেক, মদের ভাটির মালিক ও তার গুন্ডাদের হামলার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি আগে যেখানে ৯৫% শ্রমিক মদ খেতেন, সেখানে আন্দোলনের শেষে খেতেন মাত্র ৫% — যাঁরা খেতেন তাঁরাও মদ্যপানকে সামাজিক অপরাধ মনে করে লুকিয়ে চুরিয়ে খেতেন।

শিক্ষা আনে চেতনা

শ্রমিকরা প্রায় সবাই ছিলেন নিরক্ষর। তাঁদের সন্তানদেরও পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল না। ভিলাই ইস্পাত কারখানা কেবল অফিসার ও স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য স্কুল চালাত।

কিন্তু যে কোন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন চেতনার, আর চেতনার জন্য চাই শিক্ষা। CMSS-এর উদ্যোগে দল্লি রাজহরায় ছয়টি প্রাইমারি স্কুল গড়ে ওঠে। বয়স্ক-শিক্ষার কর্মসূচী নেওয়া হয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। ইউনিয়নের আন্দোলনের চাপে সরকার এবং BSP কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় তিনটি উচ্চ মাধ্যমিক, বেশ কয়েকটি মাধ্যমিক ও অনেকগুলি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করতে।

স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের পরই মানুষের সবচেয়ে জরুরী স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা। CMSS গঠনের আগে যেমন ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে, তেমনই ছিল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও। অধিকাংশ ঠিকা শ্রমিক BSP পরিচালিত হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পেতেন না, যে সামান্য অংশ সুযোগের অধিকারী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত কুকুর-বেড়ালের মত। শ্রমিক বস্তিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না, জঞ্জাল সাফাই-এর ব্যবস্থা ছিল না।

১৯৮১তে নিয়োগীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা 'স্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রাম' শুরু করেন। প্রথম ধাপ ছিল সাফাই আন্দোলন, BSP কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হয় নিয়মিত জঞ্জাল সাফাইএর ব্যবস্থা করতে। আন্দোলনের চাপে সরকার ও BSP কর্তৃপক্ষ প্রতিটি শ্রমিক বসতিতে একাধিক নলকূপ বসাতে বাধ্য হয়।

শ্রমিকদের আরেকটি দৃষ্টান্তমূলক কাজ—শহীদ হাসপাতাল। ১৯৭৭এর ১১জুন শহীদের স্মৃতিতে নিবেদিত 'মেহনতি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মেহনতি মানুষের নিজস্ব কর্মসূচী' নিয়ে এই হাসপাতাল গড়ে ওঠে শ্রমিকদের উদ্যোগে, পুরোপুরি তাঁদেরই অর্থে, শ্রমিকদরদী কিছু চিকিৎসকদের সহায়তায় ধীরে ধীরে, কিন্তু স্বনির্ভরতার পথ ধরে।

১৯৮৩র ৩রা জুন ১৫টি বেড নিয়ে শহীদ হাসপাতালের যাত্রা শুরু, এক দশকের মধ্যে প্রায় সব প্রয়োজনীয় আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন ৭০ বেডের হাসপাতালটি এক বিশাল এলাকার গরীব মানুষের আশা ভরসার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মানুষ সেখানে পেতেন সুলভে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা। মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করার ব্রত নিয়েছিল এ হাসপাতাল। আর

প্রয়াস চালাত স্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার, মেহনতি মানুষের ন্যায্য আন্দোলনগুলির পাশে দাঁড়ানোর।

নতুন সংস্কৃতির আলো

আগে শ্রমিকরা অবসর সময় কাটাতেন মদ খেয়ে। মদ খাওয়া বন্ধ, এবার কেমন করে কাটবে সময়? শ্রমিকরা অবক্ষয়ী হিন্দি সিনেমা দেখে সময় কাটাবেন?

নিয়োগী শ্রমিকদের মধ্যে থেকে প্রতিভা খুঁজে বার করতে থাকলেন, যে হাত পাথর ভাঙে, ঝুড়ি ওঠায় সে হাতে লেখা হতে থাকল গান-কবিতা, উঠে এলেন গায়ক-নাট্যকর্মী। তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠল 'নয়া আজ্ঞোর লোক-সংস্কৃতিক মঞ্চ।' নয়া আজ্ঞোর — ছত্তিশগড়ি শব্দ, যার অর্থ নতুন সূর্যের কিরণ।

ছত্তিশগড়ি লোকগীতির সুরে, ছত্তিশগড়ি নাট্যরীতিতে তৈরি হল গান, নাটক যা স্থানীয় মানুষের কাছে পরিচিত, কিন্তু যার মর্মবস্তু নতুন, আশার কথা বলে যে গান-কবিতা-নাটক, পরিবর্তনের আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করে যে শিল্প তা রচনা করতে থাকলেন শ্রমজীবী শিল্পীরা।

মানুষের পড়ার আগ্রহকে বাড়াতে ইউনিয়ন দপ্তরগুলিতে গড়ে উঠল লাইব্রেরি। ভাল সিনেমা দেখার আগ্রহকে বাড়াতে ধীরে ধীরে এল স্লাইড প্রোজেক্টর, 16mm প্রজেক্টর এবং টিভি-ভিসিআর ও সুস্থ ফিল্মের ক্যাসেটের লাইব্রেরি। যাঁরা খেলাধুলা-শরীরচর্চায় আগ্রহী তাঁদের জন্য গড়ে উঠল ১৯৭৭এর শহীদ বালকের স্মৃতিতে 'শহীদ সুদামা ক্লাব'।

নিজের জঙ্গলকে জানো

পরিবেশ-চেতনাও সামিল ছিল নিয়োগীর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনের কর্মসূচীতে। নিয়োগী মনে করতেন পরিবেশ রক্ষায় এলাকার ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ জরুরী, মানুষকে বুঝতে হবে পরিবেশের সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্ক। তাহলেই সে পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয় এবং সচেষ্ট হবে।

বিকল্প পরিবেশ-ভাবনার একটি মডেল গড়ে উঠেছিল দল্লি রাজহরার ইউনিয়ন দপ্তরের পেছনে। শ্রমিকদের যত্নে-মমতায় লোহা পাথর ভরা উষর ভূমিতে গড়ে উঠেছিল আদিবাসি জীবনের অপরিহার্য গাছ-গাছালির একটি ছোট বন। সেই কর্মসূচীর নাম — 'আপনা জঙ্গল কো পহচানো' আর্থাৎ 'নিজের জঙ্গলকে জানো'। নিয়োগী মনে করতেন আইন করে বা বন বিভাগের সিপাহীদের দিয়ে গাছ-কাটা বন্ধ করা যায় না। মানুষ যদি জানে কোনটি কি গাছ, কোন গাছ কি কাজে লাগ তাহলে সে নিজে গাছ কাটবে না, অন্যদেরও গাছ কাটতে বাধা দেবে।

মেশিনিকরণের বিকল্প ঃ অর্ধ মেশিনিকরণ

গত দুই দশক ধরে শিল্পের আধুনিকীকরণের নামে চলছে যথেচ্ছ বিদেশি প্রযুক্তির আমদানি এবং শ্রমিক ছাঁটাই। বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো শুরুতে আধুনিকীকরণ-মেশিনিকরণ-কম্পুটরিকরণের তীব্র বিরোধিতা করলেও পরে হাত মিলিয়ে নিয়েছিলেন অপ্রয়োজনীয় বিদেশি প্রযুক্তিগুলির সঙ্গে।

আধুনিকীকরণের আঘাত এসে পড়েছিল দল্লি রাজহরার লোহা খনিতেও, কর্মচ্যুত হতে চলেছিলেন প্রায় দশ হাজার শ্রমিক, পরোক্ষভাবে লোহাখনির ওপর নির্ভরশীল দুই লক্ষ মানুষের রুজি-রোজগার বিপন্ন হতে চলেছিল। ভিলাই ইস্পাত কারখানার সঙ্গে যুক্ত কিছু সমর্থক ইঞ্জিনিয়ার ও অফিসারের গোপন সহায়তায় নিয়োগী হিসাব করে দেখালেন সাবেকি মানবীকৃত (manual) খনিতে উৎপাদন খরচ, মেশিনিকৃত খনির উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম। অন্যদিকে অযৌক্তিক মেসিনিকরণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে শ্রমিদের সাথে সামিল করেন এলাকার ব্যাপক মানুষকে।

কেবল এটুকুই নয়—বিজ্ঞানের প্রগতির সুযোগ নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার সাথে সাথে শ্রমিকদের জীবিকা বজায় রাখতে তিনি রচনা করেন অর্ধ-মেসিনিকরণের এক যোজনা। আন্দোলনের চাপে BSP কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় অর্ধ-মেশিনিকরণের যোজনা দল্লি খনিতে চালু করতে।

আজ যখন নয়া শিল্পনীতি, নয়া আর্থিকনীতির আক্রমণের সামনে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবিকা বিপন্ন, তখন অবশ্যই বিকল্পের সন্ধান পাওয়া যাবে নিয়োগীর নেতৃত্বে চলা মেশিনিকরণ বিরোধী আন্দোলন থেকে।

ইতিহাস-চেতনা

ইউনিয়ন আর ইতিহাস চেতনা ?

কোন জনসম্প্রদায়ই পরিবর্তনমুখি আন্দোলনে পর্যাপ্ত উৎসাহ পেতে পারে না যদি না সে তার নিজের অতীত ইতিহাস থেকে উদ্দীপনা পায়। কেবল রুশ বিপ্লব বা চীন বিপ্লবের ইতিহাস, দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের আন্দোলনের শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

ছত্তিশগড়ে ১৯৭৭এর আগে জন-আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ছিল না। নিয়োগীর নেতৃত্বে ইউনিয়নের তথ্য অনুসন্ধানী দল খুঁজে বার করলেন এক জননায়ককে। বীর নারায়ণ সিংহ ছত্তিশগড়ের প্রথম শহীদ। ১৮৫৭এ ছত্তিশগড়ের আদিবাসি কৃষকদের তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তি যুদ্ধে, দীর্ঘ লড়াইএর পর ব্রিটিশরা নারায়ণ সিংহকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদন্ড দেয়। ইংরেজ শাসক নারায়ণ সিংহকে প্রচারিত করেছিল এক ডাকাত হিসাবে। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশশাসকদের কাছেও মর্যাদা পাননি নারায়ণ সিংহ।

নিয়োগী বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে বীর নারায়ণ সিংহের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বার করে আনেন। তাঁর কাহিনী নিয়ে রচিত হয় গান, প্রকাশিত হয় পুস্তিকা, 'নয়া আজ্ঞোর' নাটকের দল গ্রামের গ্রামে 'বীর নারায়ণ সিংহ' নাটক অভিনয় করতে থাকেন। ছত্তিশগড়ের জনতার শোষণ মুক্তির আকাঙ্খাকে তীব্র করে তুলতে থাকেন শহীদ বীর নারায়ণ সিংহ।

নারীরা অর্ধেক আকাশ

দেশের বামপন্থী সংগঠনগুলি মুখে নারীমুক্তির কথা, নারীর সমানাধিকারের কথা বললেও তাদের কর্মসূচীতে নারীদের সমস্যা বিশেষ স্থান পায় না, সংগঠনের নেতৃত্বে নারীদের সংখ্যা থাকে শূন্য অথবা নগণ্য।

নিয়োগী মানতেন—নারী হলেন অর্ধেক আকাশ। নারীমুক্তি না হলে শোষিত মানুষের শোষণ মুক্তি হতে পারে না। তাই শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠনগুলির পাশে পাশে গড়ে ওঠে 'মহিলা মুক্তি মোর্চা'। সমস্ত সংগঠনের নেতৃত্বেই সংখ্যার অনুপাতে স্থান করে নেন মহিলারা। আন্দোলনগুলির বাস্তব নেতৃত্বেও তাঁরা এগিয়ে আসেন। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনে 'মহিলা মুক্তি'র ভূমিকা ছিল খুবই উজ্জ্বল।

শ্রমিকরা সমাজ পরিবর্তনের নেতা

নিয়োগী বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জানতেন সমাজ পরিবর্তনে অন্যান্য শোষিত মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর আছে। এই ধারণা বাস্তব রূপ পেয়েছিল ছত্তিশগড়ে।

শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, খেতমজুর, অন্যান্য মেহনতি মানুষ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদের প্রগতিবাদী অংশকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা'। জমির সমস্যা, মজুরির সমস্যা ছাড়াও মোর্চা লড়াই করত—পরিবেশ রক্ষার জন্য, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে, শিক্ষার দাবিতে, স্বাস্থ্যের দাবিতে...। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার কর্মসূচীতে সামিল ছিল নিপীড়িত ছত্তিশগড়ি জাতিসত্বার শোষণ মুক্তির প্রশ্ন, ছত্তিশগড়িদের আত্ম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও।

সংগ্রামে অজেয়

নিয়োগীর আরেকটি বড় প্রতিভার পরিচয় এই যে, তিনি কঠিন কঠিন লড়াইকেও বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতেন।

পশ্চাদপদ অঞ্চল ছত্তিশগড়ে উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত কৃষিভিত্তক, শিল্পের বিকাশ খুবই কম, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অনুপস্থিত। পিছিয়ে পড়া ছত্তিশগড়ের মানুষ — অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, দুর্বল তাঁদের আর্থিক অবস্থা। মানুষগুলির পক্ষে কাজ করবে এমন বড় রাজনৈতিক দল বা সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন নেই। অন্যদিকে — চারিধারে শত্রু বেষ্টনী —জমির মালিক, কলকারখানার মালিকদের সাথে হাত মিলিয়েছে পুলিশ, প্রশাসন বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল ও তাদের শাখা সংগঠন। এহেন প্রতিকূল অবস্থাতেও বার বার শত্রুবেষ্টনী চূর্ণ করে বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেছে নিয়োগীর পরিচালনাধীন জন-আন্দোলন।

এর কারণ—শ্রমিকদের ভেতরের ও বাইরের সমস্ত শক্তিকে একত্র করার অভূতপূর্ব দক্ষতা ছিল নিয়োগীর মধ্যে। তাঁর কাছে জন-আন্দোলন ছিল এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মত যাকে অনেক সংগ্রাম, সন্ধি, বিরতি আর চড়াই-উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। সংগ্রাম চলাকালীন একদিকে নিয়োগী আন্দোলনকারী শক্তিকে বেশি বেশি শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ করতে থাকতেন। অন্যদিকে আন্দোলনের মিত্রশক্তিকে কাছে টেনে আনার কাজ চালিয়ে যেতেন। মিত্রশক্তির একটা অংশ ছিল স্থায়ী —গরীব চাষি, খেতমজুর, শ্রমিক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের এক অংশ। কিছু মিত্রকে পাওয়া যেত সাময়িক ভাবে—শাসক

শ্রেণীর নানা অন্তর্বিরোধের জন্য কিছু শক্তি কখনও কখনও আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়াত। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করা হত আন্দোলনের স্বার্থকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। কখনও আমলাতন্ত্রের কোন আমলার সমর্থন পাওয়া যেত। কখনও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্র-সরকারের, কখনও বা কেন্দ্র-সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের মনোভাব আন্দোলনের কাজে লাগত। শাসক পার্টিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোয়ও নিয়োগীর জুড়ি পাওয়া ভার। আইন-আদালত বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে, কিন্তু ময়দানি লড়াইএর পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার ফাঁকফোকরগুলিকে, আইনি সুযোগসুবিধাগুলিকে কাজে লাগানোয় নিয়োগী ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

এ সব কারণেই নিয়োগীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় সবগুলি সংগ্রামই অজেয় হয়ে উঠত।

এক নিয়োগী থেকে হাজার নিয়োগী

ওপরে যে বর্ণনা দিলাম তা নিয়োগীর কাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের পরিচয় মাত্র। আর নিয়োগীর নেতৃত্বাধীন সংগঠন ও আন্দোলন ছিল ছত্তিশগড়ের পাঁচটি জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। স্বভাবতই একা একজন মানুষের পক্ষে, তা তিনি যত প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাসম্পন্নই হন না কেন, এত বড় কাজ একা করা অসম্ভব। আর নিয়োগী তা চাইতেন না, নেতৃত্বের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না, তিনি চাইতেন গরীব মানুষের মধ্যে থেকে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে নেতা তৈরি হন, যাতে আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য গরীব মানুষকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে না হয়। সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়োগীর লক্ষ্য ছিল মানুষকে সক্রিয় করা।

তিনি সদস্যদের বোঝাতেন যাতে নির্দিষ্ট সমস্যার ওপর প্রত্যেকে বলতে শেখে, আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে পারে, জনসভায় বক্তৃতা দিতে পারে। সাধারণ সদস্যরা যাতে নিজেদের বক্তব্য রাখতে উৎসাহী হয়, নেতার কথার পুনরাবৃত্তি না করে তাই তিনি নিজে বলতেন সবার শেষে।

কেউ কোন কাজে উদ্যোগী হলে, কোন কাজের প্রস্তাব দিলে সেই কাজে তাঁকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন, ব্যক্তিগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে তাকে সবরকম সহযোগিতা করতেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকল সদস্যের মত প্রকাশের ওপর তিনি গুরুত্ব দিতেন। সমস্যার চরিত্র, সমস্যা সমাধানের পথ সম্পর্কে অন্যান্যদের মতামত শুনে, সেসব মতামতের সার সংকলন করে তিনি বিষয়গুলিকে সূত্রবদ্ধ করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে নানা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগত বিষয়ে অন্যদের শিক্ষিত করার জন্য, তাঁদের মুখে ভাষা ফোটানোর জন্য তিনি নিজে প্রথমে বলে তারপর অন্যদের বলতে বলতেন। নানা মতের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশেষ প্রক্রিয়া তিনি চালু করেছিলেন।

মুখে যারা আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রের জন্য গলা ফাটায়, কিন্তু আসলে যাদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সবার আগোচরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; যারা সভা-সমিতিগুলিতে নিজেদের পিছিয়ে

থাকা সাধারণ সদস্যদের অবস্থানে নিয়ে আসার ভান করে, কিন্তু আসলে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ে — নিয়োগী তাদের পদ্ধতিকে বিরোধিতা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে যতদূর সম্ভব ব্যাপক আলাপ আলোচনা করতে হবে। এই স্তরে নেতা ও কর্মীর মত প্রকাশের সমান অধিকার। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সমগ্র সংগঠন কাজ করবে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত নেতৃত্বের পরিচালনায়। জরুরী যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কর্মীরা নেতৃত্বের নির্দেশ পালন করবেন, কিন্তু কাজের পর কর্মীদের পুরো অধিকার থাকবে কাজের, নেতৃত্বের নির্দেশ পর্যালোচনা করার।

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদ বা অভিবাবকবাদকে নিয়োগী প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে, নেতারা কখনওই নির্দেশ দিতে পারবেন না, তাঁদের সঙ্গে তিনি সহমত ছিলেন না। তিনি মনে করতেন কোন নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে, আন্দোলনের কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ছাড়া কাজ বা আন্দোলন সফল হয় না। তাই নেতৃত্বকে বা নির্দিষ্ট কাজের জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেই হয়। কর্তৃত্ববাদী প্রবণতাকে রোধ করা যায়, যদি সদস্যরা নেতৃত্বের সমালোচনা করার, কাজের পর্যালোচনা করার পদ্ধতিকে অনুসরণ করেন, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পথকে গ্রহণ করেন।

নিয়োগী সংগঠনের মধ্যে বা বাইরে যে কোন ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের ওপর জোর দিতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন কর্মীদের স্বাধীন বিকাশের জন্য সংগঠন ও নেতৃত্ব দায়বদ্ধ। ব্যক্তির বিকাশ যদি যৌথ প্রক্রিয়ায় হয় তাহলে সেই বিকাশ দ্রুত ও সঠিকভাবে হতে পারে। নেতাদের সযত্ন পরিচর্যাতেই কর্মীরা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতে পারেন।

সারা জীবন ধরে ওপরের নীতিগুলিতে কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নিয়োগী গড়ে তুলেছিলেন অসংখ্য জন আন্দোলনের নেতাকে।

মরণেও মৃত্যুঞ্জয়

১৯৯১এর সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখের আগে ছত্তিশগড়ের বাইরে কম মানুষই জানতেন নিয়োগীকে। ১৯৯১এর ২৮শে সেপ্টেম্বর শহীদত্ব বরণ করার পর নিয়োগী হয়ে উঠেছেন মেহনতি মানুষের মুক্তি-আকাঙ্খার প্রতীক। নিয়োগী 'সংগ্রামের সাথে নির্মাণ'এর নাম, আন্দোলনের সঙ্গে গণবিকল্প গড়ে তোলার নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষার নাম।

তাই নিয়োগীর মৃত্যুতে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা দুর্বল হলেও তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে ছত্তিশগড়ের বাইরে। নিয়োগীর জীবন ও কর্মের, ছত্তিশগড় আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে অন্যান্য জন আন্দোলন, গড়ে উঠছে নব নব 'সংঘর্ষ ও নির্মাণ'এর কাজ।

তাই আমার—আমাদের—শংকর গুহ নিয়োগী মরণেও মৃত্যুঞ্জয়।